বাংলাদেশের অতিমানবেরা

প্রথম মৌসুম

মুহাম্মদ রাগিব নিযাম

বাংলাদেশের অতিমানবেরা

প্রথম মৌসুম

রাগিব নিযাম জিসান

http://www.facebook.com/nizamjisan

একটি ই-বুক প্রকাশনা

Desh-Deshantor publications

দেশ দেশান্তর পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম।

পাহাড়মানব

বন্দর নগরী চট্টগ্রাম।

বিরামহীন বৃষ্টি হলো গোটাদিন। এখন শান্ত হয়ে গেছে প্রকৃতি, কুসুমবাগ খুলশী এলাকায় পাহাড়ে। পাহাড়ের এপাশেই বাউন্ডারির ভেতর পাঁচতলা বাড়ি। নিচ তলায় ছোট্ট ছিমছাম একটা পরিবার। মা বাবার আদরের ছোট্ট তিমূর। স্কুল শেষে ঘরে ফিরে খেলছে বাড়ির পেছনে উঠোনে । বৃষ্টি থেমে গেছে অনেক আগেই।

হঠাৎ... হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। পাহাড়টা জায়গামতো নেই। ভূমিধ্বসে পাহাড়ের উপরের ছবির মতো বাড়িগুলো নিমিষেই তলিয়ে নিচে ভেসে এলো।

আম্মুউউউ- চিৎকার করে উঠলো তিমূর। মা জাহিনা এসে দেখেন উঠোনটা পুরো পাহাড় ধ্বসে ভরে গিয়েছে।

তিমূর!!!- চিৎকার করে উঠলেন জাহিনা। যতনে আগলে রাখা ছেলেটা কোথায় গেলো?

বাবা... কোথায় তুই?

ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এর গাড়ি পৌঁছে গেছে এর এক ঘন্টা পর। মাটি খুঁড়ে বের করলো তিমূরকে। কিন্তু অসহায়ত্বের ভঙ্গীতে তাকালেন অফিসার ভবনবাসীর দিকে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কবর দিয়ে ফিরে আসার পঞ্চাশ দিন পরের কথা। তিমূরের কবরটা উঁচু হতে লাগলো। একটু একটু করে উচ্চতায় তা টিলার রূপ নিলো সাতদিনে । দশম দিনে দেখা গেলো মাটি ফুঁড়ে উঠা একটা হাত।

এরপর পা।

এরপর বেরিয়ে এলো মাথাসহ একটা শরীর ।

বিষয়টা এতো জবরখবরের মতো গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়লো যে, টি ২০ ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা ছেড়ে মানুষ লাইন দিয়ে সেই অবয়বটিকে দেখতে আসলো। তখনও আটকে ছিলো শরীরটা। কিন্তু হায়, রাতের আঁধারেই তা কোথায় যেনো চলে গেলো।

ছেলের শোকে জাহিনা ভেঙে পড়েছেন। শোকে মুহ্যমান ।

ডিং ডং।

দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তার সামনে ঠিক তিমূরই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দুমাস আগেই না তিমূরকে কবর দিয়ে আসলেন!

অনেকক্ষণ হয় জ্ঞান ফেরে না জাহিনার।

"মা। মা।" কেউ একজন বলে উঠলো।

ঝাপসা চোখে তাকালেন জাহিনা। এ যে তার ছেলেই।

বাবা তুই বেঁচে আছিস?- জাহিনা বললেন।

-মা আমি তো মরিনি। আমি তো বেঁচে আছি।

১১বছর পরের ঘটনা।

হায়ার মিডিয়ামে পড়া তিমূর শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। তার মা-বাবার মূখে প্রশান্তির হাসি। কোনো অলৌকিক কারণে বেঁচে ফিরেছে তাঁদের ছেলে।

"তিমূর। তোমার বেঁচে ফেরাটা মানুষের জন্য। সময় হয়েছে মানুষকে সেবা করার।" স্বপ্নে কেউ বলছে।

ঘুম ভেঙে উঠে গেলো হকচকিয়ে। তাহলে কি তিমূরকে কিছু করতে হবে?

-হ্যাঁ করতে হবে।

মাথা ঘুরিয়ে দেখলো এক অদ্ভুত দর্শন লোক। দেখতে দরবেশের মতন।

-আপনি কে?

-আমি কেউ একজন হবো। ধরতে পারো তোমার শিক্ষক। এখন থেকে তুমি শিখবে।

-শিখবো? হা-হা-হা। আমার তো অনেক শেখা হয়েছে। আপনি কি শেখাবেন?

-মানুষকে ভালোবাসতে শেখাবো।

সেই ১১বছর পর আবার ফিরে এসেছে বর্ষনমূখর দিন। আজ চট্টগ্রাম ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টিতে।

কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের এডমিট কার্ড নিয়ে বাসায় ফিরে রুমে ঢুকলো তিমূর ।

কড় কড় কড়াৎ। কোথাও বজ্র পড়লো।

হঠাৎ মাটি থরথর করে কাঁপা শুরু করলো। আগের বাসায় না থাকলেও এর থেকে একটু দুরে ১১টি বছর আগে একটি ভবনে ওরা ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছে।

-এই তিমুর কোথায় যাচ্ছিস?

-এইতো মা চলে আসবো।

টিঁউ টিঁউ টিঁউ।

সাইরেন বাজিয়ে ফায়ার সার্ভিস ঢুকছে। যে কোনো সময় ধ্বস নামতে পারে।

এবং অবশেষে তা হতে চলেছে।

"সবাই সরে দাঁড়াও।" গম গমে গলায় কে যেনো বলে উঠলো।

শরীরে কেমন যেনো একটা তাগিদ অনুভব করছে তিমূর। তার শরীরটা অদ্ভুত রকমের বড়ো হতে শুরু করেছে। ঘাস, লতায় পেঁচিয়ে ধরেছে। থর থর কাঁপছে পাহাড়। হঠাৎ বিশ ফিট হয়ে গেলো তিমূর। গুম গুম শব্দে ভারী পায়ে এসে পাহাড়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো।

"সবাই সরে আসুন পাহাড় থেকে" বলে অতিমানবের মুখে পরাবাস্তব হাসি। ১১বছর আগে পাহাড়ের মাটিতে মিশে গিয়েছিলো যে।

কেউ একজনকে এদিকে আসতে দেখা গেলো। ইনি ডিজিএফআই এজেন্ট রিশাদ।

এজেন্ট রিশাদ সম্পর্কে বলে রাখা দরকার, তাঁকে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীতে। ফিল্ড ওয়ার্ক হিসেবে তাকে কাজ দেয়া হয়েছে দেশের অতিমানবদের একত্রিত করার। যাদের নিয়ে একটা শান্তিমূলক সংঘ তৈরি করা হবে।

তিমূরকে দেখেই রিশাদ বলে উঠলো, "হু আর ইউ জেন্টেলম্যান?"

"আমি...? পাহাড়মানব..." বলেই হাসলো তিমূর।

মাটিমানব

ক্লান্তি, বিষাদ অবসন্নতা।

কোথাও যেনো ছুঁয়ে যাচ্ছে জায়েককে। বাবাকে এমন অবস্থায় পড়তে হবে তার কারণেই, এটা যেনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিছুদিন আগের কথা। নীলা বিয়ের চাপ দিচ্ছে। কাছাকাছি সমবয়সী হওয়ায় ঝামেলা। কুমিল্লা নামের এই মফঃস্বলে বিয়েটা মেয়েদের উপর তাড়াতাড়িই চাপে। সেক্ষেত্রে নীলার বয়স যেখানে বাইশের কাছে, ২৪ বছরের জায়েককে অনেক চাপ পোহাতে হচ্ছে। বাবার কাপড়ের দোকান, ইটের ভাটা, নিজের গ্যারেজ, নিজের মুরগীর ফার্ম, মাছের ব্যবসা এবং তার উপর পড়ালেখা।বয়সের পার্থক্য দুবছরের মানে কুমিল্লা ভার্সিটিতে তারা দু ব্যাচ আগে পেছনে। পরিচয়টা কোচিং এ। কতো মেয়ে চোখের সামনে দিয়ে এলো গেলো। কিন্তু কখনো কোচিং এ পড়াতে গিয়ে এমনতরো ঝামেলায় পড়ে নি জায়েক। বাসা থেকে দু গলি পরে থাকা মেয়েটি যে কোচিং এ এমন চোখ টেপটেপি করবে, বালাই ষাট!

-তুমি বুঝছো মানুষ হবা না।

-ক্যান?

-এত্তো সৎ ক্যান তুমি? কোচিং এ প্রেমে পড়লা ব্যস অমন কইরা পড়ানো ছাইড়া দিতে হবে?

-হ তোমারে এইবার প্রেম শিখামু।

-রাখো তোমার প্রেম। বাসায় বিয়ার চাপ দেয়। আর উনি ডিমের ভিতর কুসুমের ঘনত্ব বের করে।

হতাশা কি চেপে ধরে? মানুষের প্রেম-ভালবাসার আবেগ কি বাস্তবতার কাছে হার মানে। পুরুষদের কখনো হারতে নেই। তাই তারা বাস্তবতায় ফিরে আসে বেঁচে থাকার তাগিদে।

-আব্বা দিনতারিখ ঠিক কইরালাও।

-বেয়াদব! নিজের বিয়ার কথা কেউ নিজে কয়?

-কিন্তু জায়েকের বাপ তোমার পোলারে তো নীলায় তাড়াতাড়ি করতে কইছে।

-আমি টাকার যোগান আনি। তুই নীলার বাপের লগে কথা আগাইয়া ল।

দিন যায় যায় দিন। একটুও বিরাম নেই। সামনে বিয়ের সানাই বাজবে। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। ছেলের আকদ করেছেন কিন্তু বিয়ের যে খরচপাতি ওটা? কিছুটা ঘাটতি বাজেটে। শংকার ডংকা বেজে যেনো না যায়। ধার কর্য এ শহরে বিপদজনক। ঠিক সময়ে ফেরত না দিলে দিনে দুপুরে গায়েব হয়ে যেতে হয়।

-আরে রফিক সাব যে।

-জীবনে এইরকম কইরা আওন লাগবো ভাবি নাই।

-আরে সমস্যা নাই। যা লাগে নেন। পরেরটা পরে দিয়েন।

মন্তাজের কাছে থেকে ধার নিয়ে বিয়েটা চুকে দিয়ে ঘরের ছেলের বৌকে তুললেন। কিন্তু এই মন্ত াজ যে এতো ঝামেলার লোক জানা ছিলো না।

একটা সময় ফেরত চাইলেও দেয়া যায় না। আজ সেই সময় হাতের পাশে চলে এলেও টাকা ফেরত দেয়া খুব কঠিন।

দেয়া খুব কঠিন।

"পোলার বিয়া সারছেন তো?" গম্ভীর গলায় কে যেনো ঢুকলো রফিক সাহেবের কাপড়ের দোকানে।

-আরে মন্তাজ যে বসো বসো।

-চাচা সময় নাই। আমার থিকা টাকা নিছেন যে ঐগুলা ফেরত দেওন লাগবো।

-আরে হাতে তো টাকা নাই ভাইস্তা। একটু সময় দেও।

-কইলাম সময় নাই। টেকা দেন।

-পরের মাসে দেই বাবা?

-ঐ তরা ভিত্রে ঢুইকা ক্যাশ ভাঙ। বইয়া আসোস ক্যা বাইরে?

-এই মন্তাইজ্যা রফিক চাচার ক্যাশে হাত দিবার সাহস পাইলি কইত্তন?!

-হালায় কয় কি ঐ দোকান ভাঙ হালার মাথা ফাইট্টা ছুরি বসা পেডে।

-অই অই অই

মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে। পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। কিছু ভালোবাসার মানুষ ধরাধরি করে মেডিকেলে নিয়ে গেলো।জায়েক এসব কিছু জানেনা। বৌকে বাড়িতে রেখে ইট ভাটায় চলেছে। ওখানে ক্যাশে বসতে হবে।

-হেহে কই যাস?

-কিরে নূরা পাগলা আইজ এতো হাসি?

-আল্লাহ দুনিয়াতে ভালো মানুষ পাডায় সেবা করনের জইন্য

-কস কি পাগলা?

-তোর দিন আইতাছে মানুষের জন্য খাটন লাগবো।

দশ বছর ধরে পাগলটা এই বটগাছের নিচে ধ্যানে থাকে। কেউ ঘাঁটায় না। অদ্ভুত কান্ড করে বসে মাঝে মধ্যে। তবে সবাই একে পছন্দ করে।

-তোর লিগা একটা জিনিস রাখছি

-কিরে পাগলা আমার জন্যও জিনিস রাখছোস?

আশে পাশে প্রচুর মাটির ঢেলা। একটা তুলে হাতে দিয়ে দিলো।

-যাহ্ খায়া ল।

-কি খাইতা... দুসেকেন্ডে হাতে থপ কইরা কি যেনো ভারী ঠেকলো। ওমা আস্ত তাজা আতা ফল।

-ভাটায় বইসা খায়া ল। দেরী করিস না। আর শোন যা হইবো ডরাইছ না। আমি আছি।

বিস্ফোরিত চোখে সে জায়গা থেকে পাগলার দিকে তাকাতে তাকাতে ভাটামুখী হলো। ভাটায় এসে আতা সবটুকু খেয়ে নিলো।

এমন সময়... হুড়মুড় করে কিছু লোক ঢুকলো। এদের একজনকে চিনলো। মন্তাজ।

-তুই জায়েক নি?

-কে আপনি? চিনবার পারলাম না।

-তর বাপেরে ছুরি মারছি। এইবার তরে মাটিত পুঁইতা দিমু। ল তোরা সব ক্যাশ ভাঙ

-এই খবরদার আমার ক্যাশে হাত দিবি না খান*র পোলারা!

-মার শালারে!

বেমক্কা বাড়ি খেয়ে মাথায় জায়েকের দুনিয়া অন্ধকার। মারের ভেতরও এই অদম্য ছেলের দুর্জেয় সাহসিক প্রতিরোধ। কিন্তু মানতে কষ্ট হয়। সত্যরাও হেরে যায় যুদ্ধে। অসত্যের চিল পাখা মেলে ভর করে। ছায়া ঘিরে নেয় চারপাশ।

আস্তে আস্তে মিশে যাচ্ছে জায়েক ইট ভাটার মাটির ভেতর। অনেক ভেতরে।

তিন দিন পর...

ধুম ধুম ধুম। এক দুই তিনবার সেই মাটির ঢিবি থেকে আওয়াজ করে একটা হাত বেরিয়ে এলো

ঢিবিটা ধ্বংস করে। একটা মানুষ বেরিয়ে এলো।

-প... পানি খামু

-এই ল। মন ভইরা খা।

মাটির ঢিবি থেকে বেরিয়ে অবিশ্বাস্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পানির জন্য সাহায্যকারীর দিকে।

-আতা কামে দিছে। এইবার যা। মাইনষের কামে যা। সেবা কর।

-হ নূরা পাগলা। আমার বাপ, আমারে মারার প্রতিশোধ এইবার লমু।

রফিক সাহেবের বাড়িতে তিনদিন ধরে শোকের মাতম। সদ্য বিবাহিত নীলার হাতের মেহেদী শুকায় নি কিন্তু এরি মধ্যে তার স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছে না। শ্বশুর মেডিকেলে। শ্বাশুড়ি ম্যুহমান শোকে।

-নীলা। আম্মা।

জায়েক! বেঁচে আছে? নীলা দৌড়ে আসে। স্বামী বেঁচে আছে এটা যেনো বিশ্বাসই হয় না। বুকে লুটিয়ে

হাউমাউ শুরু করলো।

-জায়েক আব্বারে শেষ কইরা ফেলাইলো।

-কিচ্ছু করতে পারবো না। আমি শেষ কইরা দিমু মন্তাজরে। তুমি আম্মারে দেইখা রাইখো।

আখাউড়া স্টেশনের আগে ট্রেন দখল করেছে ডাকাতরা। সেটা রেসকিউ করতে প্ল্যানে নেমেছে এজেন্ট রিশাদ। বগি থেকে নামতেই দু তিন জন তেড়ে এলো। ফাইট ব্যাক দিতে দিতে একজন

বিশাশদেহীকে দেখা গেলো। ঘুঁষি বাগিয়ে তেড়ে আসতেই হঠাৎ একটা মাটির প্রাচীরে লেগে বাম্প করলো। ছিটকে পড়লো কয়েক হাত দূরে কিছু মাটির বিশাল টুকরো।

-আপনি ইঞ্জিন বগিতে গিয়ে কিছু বন্দী আছে ওদের উদ্ধার করেন।

-কিন্তু আপনি কে?

-আমি?... মাটিমানব। স্মিত হাসলো জায়েক।

জুজুমানব

পূন্যভুমি সিলেট।

এখানে ওখানে জড়িয়ে আছে শত বছরের ইতিহাস। জড়িয়ে থাকে বুজুর্গদের আশীর্বাদ। কেউ হয়তো এরই কারণে আল্লাহর অনুগ্রহে বেঁচে থাকে। হয়তোবা সূর্যটাও চোখ মেলে অশুভ যে কোনো কিছুকে ঠেকাতে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে চা বাগান। শ্বশুওয়ালেস চাবাগানটির কেয়ার টেকার হামিদের ছেলে ঘুরে ঘুরে কলেজে পৌছায় টাইম মতো। আবার বিকেলে ফেরে ঠিক সময়ে।

-এই জামান।

-হ্যাঁ বলো তাজিন ভাইয়া। তাজিন গার্ডেন ম্যানেজারের ছেলে। এক ব্যাচ বড়ো। তবে দুজনেরই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

-গার্ডেনে কি জানি হচ্ছে শুনেছি।

-হ্যাঁ, আমিও। কি একটা নাকি নিয়ে যায় বাচ্চাদের।

-সতর্ক করা দরকার মানুষ জন কে।

-জুজুকে কখনো থামানো যায় না।

-হেহ। বললেই হলো?

একটু আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়ে হামিদ পুত্র জামান। মনিবের ছেলের এই রহস্যঘেরা দেশের অজানার প্রতি বেশি টান। এই টান যে কোনো সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিপদেও ফেলতে পারে। তবে দেখে শুনে রাখা হচ্ছে বলে তাজিনকে নিয়ে অতো ভাবনা নাই।

সে অনেকদিন পার হওয়ার পর। একদিন হঠাৎ করে বাগানে হইচই পড়ে গেলো। আজ একসাথে তিনটি মহিলা কর্মীর কোল থেকে বাচ্চা গায়েব। তিনটি তিনটি বাচ্চা গায়েব মানে অনেক বড়ো সড়ো ব্যাপার। তাই একটা প্রতিরোধের ব্যাপার স্যাপার থাকতে হবে।

-হামিদ মিয়া... গার্ডেন ম্যানেজার শফিক সাহেব উদ্বিগ্ন আজকের ব্যাপার নিয়ে। এমন চলতে থাকলে গোটা গার্ডেনের সব কর্মী সব কাজই বন্ধ করে দিবে।

-বলেন সাব। হামিদও বেশ চিন্তিত।

-কিছু তো বুঝতেছি না।

-স্যার ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করা করা যায় না।

-তা যায়। তবে সব সময় কি বিদ্যুৎ কি থাকবে?

-সেটাও কথা।

এদিকে চুপি চুপি শলা পরামর্শ করে তাজিন ও জামান। তাজিন বাগান এলাকার বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তিত। তার উপর তাজিনের ছোট বোন মাত্র আড়াই বছরের। এর উপর রাত দিন জুজুর ভয়ে সন্ত্রস্ত

থাকে তার মা।

-জামান আমাদের বয়সের পোলাপান রেডি করা যায় না?

-তা যায়। কিন্তু কেনো তাজিন ভাই?

-আমরা রাতে এলাকা পাহারা দেবো।

-দিয়ে কি লাভ?

-কি লাভ মানে? বাচ্চা গায়েব হয়ে যাচ্ছে আমাদের কি কিছুই করার নাই?

-পারবেন না।

-পারতে হবে। অন্তত একটা বাচ্চা যেনো খোয়া না যায় সেজন্য সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

-আপনি অদ্ভুত। পারেনও।

সে রাতে ঘটা করে মশাল জ্বালানো হলো ফ্লাডলাইটের বিকল্প হিসেবে আর কি!

রাত বাড়ছে। দূরে কোথাও শিয়াল ডেকে উঠলো। একটা দুটা তিনটা।

ঝি ঝি ঝি... ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা শব্দে চারপাশ কেমন যেনো মৃত্যুপুরীর ভয়াবহতায় ডুবে আছে।

সাত আসমানের উপর থেকে যদি খোদা ইনসাফ করেন তো এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াল সুন্দর জায়গাটিতে হয়তো বাচ্চারা প্রশান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

ওরা সাতজন সমবয়সীর দল আছে এখানে।

-জামান।

-কিরে মবিন্যা?

-ডর লাগেরে বন্ধু।

-হেহ্ পাগলা। তোরে কি এক টাকা চাঁদা দিয়া টয়লেট করতে হয় এখনো?

-এই জামান ফাজলামী করিস না তো। এমনিই পরিবেশ ভালো ঠেকতেছে না।

-হুম।

-হুম।

তাজিন আজ ছোট বোনকে বুলি শেখাচ্ছে। মা কিচেনে। বাবা স্টাডিতে।

-বলো হেলিকপ্টার।

-হেলিকক্তার

-ছিঃ এমনে বলে না তো।

-তিহ্ এন্নে বদেদাতো।

-আবার দুষ্টামি?

-আবাল... ভ্যাঅ্যাঅ্যা

কিছু একটা টের পেয়েছে ছোট্ট তিমা।

-অ্যাই তিমা কি হয়েছে আপুই?

-অ্যাঁ। বুত।

-কোথায় ভূত?

-ঐ...অইতানে...

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাকায় জানালার ধারে। ওখানে একটা কি ছিলো যেনো।

এখন চৈত্র। দাবদাহে জীবন অতিষ্ঠ। তাই জানালা কপাট খুলে থাকতে হয়।

-মা। মা। মা কে ডাকে তাজিন।

-কিরে। শান্তিতে থাকতে দিবি না?

-তিমা ভয় পায় তো। আমি নিজে কেমন করে ঠিক থাকি?

-তোর বাবাকে ডাকি দ্বারা।

এমন সময় ভীষণ আওয়াজ করে উঠে ঝোপটা। যেনো দশটা ষাঁড়কে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাইরে থেকে হই হই করে উঠলো সবাই।

-দাড়া আমি যাই। জামানের অ্যাপ্রোচ।

-দাঁড়া বে আমিও আসতেছি।

ঝোপের সামনে এসে স্থির হয়ে যায় জামান। পেছনের সবাই এখনো দশ পনেরো ফুট দূরে।

বিকৃত ধরনের শব্দ ভেসে আসছে। টর্চ মারতেই স্থির হয়ে গেলো জামান।

চার ফুট মানুষ আকৃতির কিছু একটা ওটা। মুখে রক্ত। হাতে একটা বাচ্চার পা। গোটা গায়ে কাঁটা।

মুখটা বানর আর কুমিরের চেহারা মেশালে যেমন হবে তেমন।

হাতে কিছু নেই তাই ওখানে দাঁড়িয়েই আছে। এদিকে জানালা পাশ থেকে তাজিন তাকিয়ে আছে।

জামান যে ভিকটিম হতে যাচ্ছে তা টের পেলো। চুপি চুপি শট গান টা নিলো হাতে। দেয়ালে ঝোলানো থেকে।

এক দুই তিন। ঠুশশ...

গুলিটা প্রশস্থ অবস্থায় বুকে ফুটো করলো প্রাণীটার। ভাবান্তর নেই প্রানীটার। লাফ দিয়ে এসে তাজিনের

গালে একটা থাবড় বসিয়ে দিলো...

এরপর আর মনে নেই...

সাত দিন পর হুঁশ ফেরে তাজিনের।

-আমি কোথায়?

-আরে নড়বেন না।

-আমার কি হয়েছিলো।

-জুজুতে পেয়েছিলো।

এতোদিন বিশ্বাস করেনি নি। তাই অনেক কষ্ট হচ্ছে। আজ বাসায় ফেরার পালা। এখনো দেখা যাচ্ছে পাহারা আছে। যদিও শফিক সাহেব তাঁর স্ত্রীকে ছোট্ট তিমাকে সহ পাঠিয়ে দিয়েছেন অনেক আগেই ধাকায়। তাজিনের

জন্য রয়ে গেলেন। ড্রইং রুমে ডিসি সাহেব আছেন কয়জন অফিসার নিয়ে।

রাত বাড়ছে। লোক জন পাহারায়।

ঘো ঘো ঘো। আবার সেই আওয়াজ। কিন্তু হঠাৎ করে তাজিনের কেমন জানি লাগছে। এটা কি জুজুর কারণেই হচ্ছে?

বিবর্ণ সবুজ রং ধারণ করছে শরীর। কেমন জেনো সরীসৃপ আকৃতি তাতে।

-তাজিন ভাইই?

-দরজাটা খুলে দে জামান। ঘোঁত ঘোঁত ঘোঁত।

আওয়াজ শুনে ডিসি, অফিসাররা, শফিক সাহেব, হামিদ ঘরের সামনে চলে এলেন। এসে বিস্ময়আভিভূত হয়ে গেলেন। তাজিনই যে এখন জুজুর মতো আকৃতিতে চলে এসেছে! সাত ফিট ছাড়িয়ে যাচ্ছে!

-আল্লেফ ইউর গান!

-থামেন! তাজিন বিকট গোঙ্গানি দিচ্ছে।

-হোল্ড ফায়ার!

-ডিসি সাহেব থামেন!

-একে গুলি করবো নাকি?

-না এ আমার ছেলে!

-কি নাম তোমার?

-আমি...? সাত ফিটের মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো হাসি... "জুজুমানব!"...

অগ্নিমানব

সেদিন সোমবার।

আকাশ আলো খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। এক পলকের সন্ধ্যায় একটা বিশালাকারে রুটি ভেসে এলো। সেই রুটির দিকে তাকিয়ে কিশোর ছেলের শখ হলো জোছনা দেখবে।

রাজশাহী শহরের কোনো একটা পাড়া। সারি সারি দালান। একেবারে শেষ মাথায় রায়হানদের সেমি পাকা টিনের বাড়ি। বাবা সরকারী চাকুরে। ঘরে মা থাকে আর ক্লাস সিক্স পড়ুয়া ছোট্ট বোনটি। আজ আকাশের চাঁদটা অনেক সুন্দর। সাথে জীবনটাও।

-কে আপনি? চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে পেছনে দেখলো একটা দরবেশ গোছের লোক।

-বাবা আমি মুসাফির। সামান্য কিছু কি খেতে পাবো এখানে?

-আপনি বসুন আমি আসছি।

মায়ের হাতে সাজানো রাতের খাবার নিয়ে আসলো। বৃদ্ধ নীরবে খেয়ে চলেছেন। খেয়ে হাত ধুয়ে দোয়া করলেন কি যেনো ফিসফিসিয়ে।

-তুমি রায়হান না?

-হ্যাঁ। আপনি জানলেন কিভাবে?

-জানতে চাইলে সবি জানা যায় বাবা।

-অদ্ভুত তো!

-অদ্ভুতের কিছু নেই। তুমি অনেক পরোপকারী। তোমার ভেতরের মানবিকতাকে শানাই দিও। এক সময় এর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়বে।

বলেই একটা জিনিস দিলেন রায়হানের হাতে। অনেকটা খেজুরের মতো।

-খেয়ো এটা।

-কি এটা?

-তবারুক।

-ধন্যবাদ।

-ভালো থেকো। মানুষের সেবা কোরো। যেখানেই পাবে ছুটে যাবে সাহায্যের জন্য।

বলেই মুসাফির বিদায় নিলেন। সেই অব্দি থেকে ঘুম আসছে না রায়হানের। কি এই জগতের রহস্য?

খানিক মোহে কি আসলেই সুখী থাকা যায়? ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যায় সে। সে তন্ময়ে ছেদ পড়ে। দেখে কিছু লোক পাশের বাড়ির তিতলিদের বাড়িতে ঢুকছে।

"অ্যাই কে আপনারা?" চিল্লিয়ে উঠলো।

দৌড়ে ছুটে গেলো সে। খপ করে কে যেনো তার মুখ চেপে ধরলো পেছন থেকে। "মুমম" বলে হাচড়ে পাঁচড়ে ছোটার আপ্রাণ চেষ্টা কিশোরের।

-ঢুকা এইটারেও।

-এই কি করতেছিস তোরা?

আশেপাশে সবাই কাঁদছে। তিতলি পাশে ওর হাত ধরে রেখে ফুঁপাচ্ছে। রায়হান এইচএচসি দেবে আর তিতলি নাইনে উঠলো।

হঠাৎ বাইরে থেকে আগুন জ্বলে উঠলো। লোক গুলো চলে গেলো। মহিলারা চিল্লাচিল্লি শুরু করে

দিলো। একটা দুর্ঘটনা ঘটার সময় নারীরা বিশৃংখল হয়ে যায়। এবং বের হবার পথ থাকলেও ছোটাছুটি করতে থাকে ঘর ময়।

-রায়হাআআন।

-চুউপ! যেটা বলি সেটা করো। যাও মা আর বড়ো ছোটো চাচীকে বের করে নিয়ে যাও। আমি আংকেল, চাচাদের, বাবলু, জায়িফকে নিয়ে বেরুচ্ছি।

-সবাই বেরিয়েছে? তিশান কোথায়? তিতলির বাবা চিল্লিয়ে উঠলো!

-তিশান কে?

বাইরে থেকে তিতলির ছোট চাচা চিল্লিয়ে উঠলেন। "আমার তিশান!!"

আগুন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বাড়িময়। লেলিহান শিখা উপরে উঠে গেছে। এ ঘর ওঘর ঘুরে দেখলো।

এইতো তিশান। পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। তুলে নিলো রায়হান।

হঠাৎ আগুন ঝলকে উঠলো। তিশানকে বাঁচাতে পিঠ এগিয়ে দিলো।

"আহ!" অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

-বাবা এইতো এদিকে!

-আংকেল নেন।

না। তিশান বেরুলেও রায়হানের বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। কাঠ কড়িতে আগুন লেগে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

"রায়হান।" চিৎকার করে কেঁদে উঠলো তিতলি। তার প্রথম না বলা ভালোবাসা। হারিয়ে গেলো আগুনে। দুই বাড়ির মানুষের কান্নার রোল পড়ে গেছে।

একদিন পর। রাজশাহী মেডিকেল কলেজে...

ঝাড়ুদাররা আলোচনা করছে।

-অদ্ভুত না?

-হয়।

-ইডা ক্যামুন হইলো।

রায়হান পোড়া অবস্থায় নিজে এসেছে ঢুলতে ঢুলতে। ইমার্জেন্সি বার্ণ ইউনিটে ডাক্তাররা ভর্তি করেছে।

সাড়ে আটত্রিশ ঘন্টা বেঁহুশ থাকার পর হঠাৎ জ্ঞান ফিরলো। কে যেনো চিল্লিয়ে কথা বলছে।

-আমি হাসপাতালে আসার সময় হাঁটার পথে দাঁড়াবি না।

-আপনে কে? ওয়ার্ড বয় চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালো।

-আমি...

লোকটা থেমে গেলো। ওয়ার্ড বয়ের পেছনে একটা রোগী। পুরো গায়ে ব্যান্ডেজ।

-ছেড়ে দে ওকে।

-কে তুই?

-ঐদিন আগুন দিয়েছিলি?

-এই কে তুই?

রায়হান এগিয়ে এলো। খপ করে লোকটার হাত ধরলো। সাথে সাথে লোকটার মুখ বিকৃত হয়ে গেলো।

-কে তুই? চাপা চিৎকার।

রোগীর শরীরে আগুন ধরে গেলো। আশেপাশের সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে।খপ করে রায়হান লোকটার গলা টিপে ধরলো। লোকটার শরীর জ্বলে উঠলো। তিনতলা থেকে ফেলে দিলো একহাতে রায়হান।

কেউ একজন চিৎকার করে বলে উঠলো- কে আপনি?

জনতার দিকে তাকিয়ে বললো "আমি অগ্নিমানব।"

যন্ত্রমানব

টেবিল ফ্যানটা একটানা ঘুরছে সেই তখন থেকে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা মানে এই গরমে লাইট জ্বালিয়ে নিতে হবে। আর তাতেই বিপত্তি। শান্ত ক্লাস থেকে ফিরেছে সেই তিনটায়। কুয়েটের ছাত্র হিসেবে তাকে রাতদিন পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই হয়। এই যেমন একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিলো মেটাল ট্রান্সফর্মিং এর উপর। রোবোটিক ডিভাইস তৈরি করতে হবে। তো, একটা কাজ করলো সে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বেছে নিলো প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃত্রিম

অঙ্গ প্রতিস্থাপনকে।

অঙ্গ প্রতিস্থাপনকে।

-শান্ত তুমি শিওর তো তুমি এটা করে দেখাতে পারবে?

-অবশ্যই পারবো স্যার।

-দেখো আবার জটিল করে ফেলো না।

-না স্যার পারবো করতে।

ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসছে, এই সময় কানে এলো পেছনে হিহিহাহা...

-এই দেখ দেখ বুদ্ধুটা

-অ্যাই ওকে বুদ্ধু ডাকবিনা খবরদার।

লজ্জা পেলো শান্ত। কিছুটা লাজুক সে।

নীলু দু ব্যাচ জুনিয়র। যদি ক্যাম্পাসে কোনোদিন মেয়েদের দিকে তাকায় না তবুও নীলু ভর্তি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার মনের ভেতর দাগ কেটে দিয়েছে।

তার মানে এই না যে নীলু ওকে ঘোরাবে। সমানে নীলুও ওকে পছন্দ করে। তাদের বাবা একে অন্যের বন্ধু।

-এই কি হচ্ছে?

-আরে শান্ত তুই এইরকম চেতস ক্যান?

-চেতবো না? আমার প্রজেক্ট ফাইল টান দিলা ক্যান? তুইতোকারি করবানা খবরদার !!!

-ও স্যরি স্যরি স্যার।

মইনুল ওদের ব্যাচের বখাটে ছাত্র। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় আছে বলে একটু মেধাবীদের গুঁতোতে পছন্দ করে।

-ফাইল দাও!!!

-নে নে। ফোট।

-বিহেভ ভালো করবা। তোমার সাথে ক্ল্যাশ নেই। তাই বলে অন্যায়ভাবে আমাকে হ্যারাস করতে পারো

না।

-আঁতেল। ভাগ।

নীলু আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়ে। মইনুল দিন দিন বেয়াড়াপনা দেখাচ্ছে। ঐতো ওদিন ও লিজাকে টিজ করেছে, কি করবে ভবিষ্যতে!

প্রজেক্ট ডে দশম দিন।

আজ সম্পূর্ণ হলো ডিভাইস এর বিল্ড আপ।

এবার তো বিশ্রামের পালা। দুদিন পর শো অফের পালা।

"সুধী ছাত্রবৃন্দ" প্রফেসর বলে চলেছেন "আজ আপনাদের সামনে ইন্সট্রুমেন্ট শো করবেন তারিক হাসান"।

মুহুর্মুহু করতালি পড়ছে। একজন প্রতিবন্ধী শিশু যার পা নেই তার পায়ে একটা ডিভাইস পড়িয়ে দেয়া হলো।

"সবাই তৈরী?"

"ক্লিক।"

"চউইইইইইইইইইইইইইইইইইইইইই"

-এই ডিভাইসটা এখন একটা বায়ো মেটালিক অরগানিজম তৈয়ার করবে।

সুন্দর একজোড়া ধাতব পায়ের আবরণ তৈরী হয়ে গেলো।

-বাবু একটু হাঁটো তো...

ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ।

হাততালির পর হাততালি। দুজন আমেরিকান পর্যবেক্ষকের সামনে একটা বিস্ময়কর ডিভাইসের অ্যাসাইনমেন্ট দেখালো শান্ত।

সাকসেসফুল প্রেজেন্টেশন করে বেরিয়ে আসতেই দেখলো মইনুল নীলুর গ্রুপটাকে র‍্যাগ করছে।

-দেখো লিজাকে এমন করো না তো প্লিজ

-অ্যাই মইনুল কি সমস্যা তোমার?

-আরি আইন্সটাইন আইসা পড়ছে দেখি!

-ভালোয় ভালোয় বলছি ওদের বিরক্ত করা ছেড়ে দাও

-ওই চল পোলাপাইন!!! এরে পরে দেইখা নিমু...

শান্ত নীলুর দিকে হেসে বেরিয়ে এলো।

বাসায় আসার মোড়টাতে একটা গাড়ি ধেয়ে এলো। ওকে এতো জোরে ধাক্কা দিয়েছে যে ধাক্কার চোটে দশ হাত দূরে গিয়ে পড়েছে।

-ডাক্তার! আমার ছেলে হাটতে পারবে তো?

-আমি সত্যি দুঃখিত। ওর দু হাত-পা তো গেছেই, ঘাড়ও ভেঙ্গে গেছে।

-পুরোপুরি চলাফেরা কবে করতে পারবে?

-আর কখনোই সে চলা ফেরা করতে পারবে না!

নীলু ডক্টরের কথা শুনে অঝোরে কাঁদা শুরু করলো। এই কি ছিলো তার কপালে। মনের মানুষটাকে এভাবে পঙ্গু দেখতে হবে?!

প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে আছে শান্ত। প্রতিদিন নীলু এসে দেখে যায়। কিন্তু শান্ত এই জীবন চায় না।

-লিজাকে প্রতিদিন ডিস্টার্ব করে মইনুল। কি করবো বলতো?

-নীলু একটা কাজ করতো।

-কি কাজ?

-বলছি।

কুয়েট প্রধান গেট। ঝাড়ুদার ঝাড়ু ফেলে ডীনের রুমের দিকে দৌড় দিয়েছে।

-স্যার অদ্ভুত জিনিস দেখলাম

-কি?

-আসেন।

-আসেন।

মইনুল খোশগল্পে মেতে উঠেছে। শান্ত নেই তাই এখন যে কোনো মেয়েকে চান্সে টিজ করতে পারে।

-হ্যালো মইনুল। ধপ করে একটা হাত পড়লো মইনুলের কাঁধে।

-তুই কে রে?!!! আমার কাঁধে হাত রাখসোস এতো বড়ো সাহস? আরে ছাড় কইতাছি!!!

"অ্যাই"!!!! ডীন দশ হাত দূর থেকে বলছেন "তুমি ওকে ব্যাথা দিচ্ছো কেনো? কে তুমি?"

ঘুরতেই দেখা গেলো ওএকটা মুখোশ পড়া লোক।

ক্যাঁচ কোঁচ করে বিশাল একটা মেটাল অবয়ব নিয়ে এসে বললো "এই ছেলেকে সাস্পেক্ট মনে হচ্ছে স্যার, আমার অ্যাক্সিডেন্টের জন্য এইই দায়ী!!!"

-কিন্তু তুমি কে?

-আমি... মুখোশ খুলে ফেললো শান্ত... এক চিলতে হাসি ফোটালো মুখে। সবাই হা হয়ে তাকিয়ে আছে।

"আমি যন্ত্রমানব"...

আঁধারমানব

"শুভ এই শুভ"

ঝটকা মেরে পেছনে তাকালো শুভ। বরিশাল বিভাগীয় শহরের এই এসএসসি পরীক্ষার্থী তার প্রিয় বান্ধবীর ডাক শুনলে সব ফেলে চলে আসতে বাধ্য।

-কিরে মীম তুই না বাসায় যাবি?

-আরে আমার হঠাৎ চটপটি খাইতে মন চাইতাছে।

-ও। আমার তো টাকা নাই

-আরে আমি খাওয়াবো তোকে।

-অ্যাঁ সূর্য কোন দিক থেকে উঠলো রে?!

স্কুল থেকে বেরিয়ে আসতেই তিন চারটা ছেলেকে বাইকের উপর বসে থাকতে দেখা গেলো।

-ও মনু ছেমড়ি দেখছু এক্কেরে পাকা টমেটুর লাহান।

-হ ইচ্ছা করতাছে গাছ থেইকা পাইড়া নিতে।

শুভর গা জ্বলে উঠলো।

-অ্যাই শালার বাইকার তোগোর খাইয়া দাইয়া কাজ নাই ছেমড়িগো ডিস্টার্ব করছ ক্যা রে?

-ওরে আইছে রে সিয়াইডি অপিসার। ভাগ এহান থিকা!

-শুভ প্লিজ থাম তো!

-না থাম্মু না! তোর কাছে মাফ চাইবো!!!

-ঐ পিচ্চি কি কইছত?

-আমার শক্ত আছে।

-দেইখা লমু তরে...!

কোনোমতে ঠান্ডা হয়ে মীমের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে সহ্য করে চলে যায়।

-তুমি এমন কেনো শুভ?

-দেখো মীম এই জন্যই তো আমি তোমাকে কেউ টিজ করুক তা চাই না!

-বাট তোমার কিছু হলে আমি ঠিক থাকবো?

-ওকে কখনো আর করবো না।

-হুম।

-কিছু বলার ছিলো।

-আমি জানি।

-না, তার পরও বলবো।

-এখন না। পরীক্ষাটা শেষ হোক তারপর।

-সেদিন কি ভিন্ন সাজে আসবো?

-মানে, আমাকে গত ঈদে একটা শার্ট দিয়েছিলি ওটা আজো পরা হয়নি।

-বলিস কি? এখনো পরা হয় নি?

-হুম।

-হুম।

এক দৃষ্টিতে একজন আরেক জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের ভেতর পৃথিবী দেখতে পায়।সে তন্ময়ে ছেদ পড়ে।

"বিলটা"। ওয়েটার দিয়ে গেলো।

-শুভ বাসায় যেতে হবে রে।

-ওকে চলে যা।

মন এক পলকে খারাপ হয়ে যায় শুভর।বাসায় তাকেও ফিরতে হবে।রিকশাতে তুলে দিয়ে বাসায় ফেরার পর দেখলো এক অদ্ভুত কান্ড।মাথায় হুড দেয়া কয়েকটা দেহ ধুপ ধাপ করে পড়ছে ছাদের উপর।

"হোয়াট দ্য..."

ছাদের উপর দৌড়ে যেতে গিয়ে আম্মাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে।

-কই যাস?

-ছাদে।

-এতো সন্ধ্যা বেলা। যাস না।

-কিছু একটা হইতেছে ছাদে।

দরজা খুলতেই একটা ঠান্ডা বাতাস ছুয়ে গেলো তাকে।

এরপর আর কিছু মনে নাই।

-বাবা শুভ ওঠ।

ঘোলা চোখে তাকিয়ে আছে। দেখে বেডের উপর শুয়ে আছে সে।

-আমার কি হইছেলো আম্মা?

-তোরে বেহুশ পাইছি সিড়িঘরে।

এক রত্তি সময় খোজে সে। বেরিয়ে পড়ে বাসা থেকে। হঠাৎ সামনে দেখতে পায় বাইকারকে।

-তোরে আইজকা আল্লাহর কাছে পাঠামু।

-ভাই কি করছি আমি?

-হাইইইইইইইইইই

-হাইইইইইইইইইই

দু হাত দিয়ে নিজেকে ঢাকার চেষ্টা করে শুভ।

হঠাৎ সামনে একটা ব্ল্যাকহোল টাইপ গর্ত তৈরি হয়ে যায়।

-এই কি এইটা কি?!!!!!!!!

-আমি নিজেই জানি না। শুভও অবাক।

-তুই কেডা? অই অই?

-আমি... আমি...

-অ্যাই ছেমড়া অ্যাই...

-আমি আঁধার মানব। শুভ বললো।

আঁধার গর্তে বাইকার ছেলেটা ঢুকেই হারিয়ে গেলো...।

রশ্মিমানব

"লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান"

গমগমে ভারী গলায় ঢাকা চীন মৈত্রী সম্মেলনে জানান দিচ্ছে কেউ একজন, "আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন কয়েকজন বিশ্বসেরা জাদুকর। ইতিমধ্যে দুতিনজন এসে তাদের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। এখন আমাদের দেখাবেন আমাদেরই দেশের কৃতী জাদুকর তানজিম রহমান।"

মুহুর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়লো গোটা হল।

হঠাৎ হল অন্ধকার হয়ে গেলো। জুতোর আওয়াজ হচ্ছে। ভারী বুটের আওয়াজে সবাই চুপ হয়ে গেলো। হঠাৎ একজায়গায় ফোকাস আলো পড়লো। দেখা গেলো কেউ ওখানে ভাসছে। আবারও করতালি। ভেসে ভেসে উড়ে উড়ে এসে নামলেন তানজিম।

"আমার মতো কারও উড়ার ইচ্ছা আছে?" উৎসুক চোখে তাকালেন দর্শকের দিকে।

এক সেকেন্ড পরে ফেটে পড়লো কিছু তরুণী।

আমি!

এক মেয়ের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুললো তানজীম। উঠে এলো মেয়েটি।

"চোখ বন্ধ করুন।"

আস্তে আস্তে মেয়েটি ভেসে উঠলো। তরুণীদের ভেতর কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়লো। মেয়েটিকে

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হলো। একটা বাউ করলেন তানজীম।

হঠাৎ পেছন থেকে তার ম্যানেজার ডাক দিলো।

"কি সমস্যা?!" বিরক্তির চোখে তানজীম তাকালো তার দিকে।

-ভাবী স্কুল থেকে ড্রাইভ করার পথে বাচ্চা সহ গাড়ীতে অ্যাকসিডেন্ট করেছেন।

উপস্থাপকের সাথে কথা বললেন তানজিম।

"দুঃখিত সুধীবৃন্দ, একটা দুঃসংবাদের কারণে তানজিমকে এখনই বিদায় নিতে হচ্ছে..."

ঢিব ঢিব ঢিব ঢিব।

-বাবা রশ্মি।

-বলো আম্মু।

-নিশাত এসেছে।

-তাই?

-এই তো। তোমার হসপিটালে ভর্তির কথা শুনে দৌড়ে চলে এসেছি। একটা মিষ্টি মেয়ে একগুচ্ছ ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে।

রশ্মি ক্যান্সার আক্রান্ত একজন ভার্সিটির স্টুডেন্ট। ফাইনাল ইয়ারে। আর নিশাত ফার্স্ট সেমিস্টারে। আগে পাড়ায় থাকতো। রশ্মি এই মেয়েকে যতোটুকু পছন্দ করে তার থেকে রশ্মির মা বেশি। তবে নিশাতও কম না। তবে একজন আরেকজনকে প্রমিজ করেছে একজন আরেকজনকে ভালোবাসবে বিয়ের পর। রশ্মি জবে ঢুকলেই বিয়ের কথা শুরু হবে।

-এই যে সরেন সরেন। রোগীকে ওটিতে নিতে হবে। ওয়ার্ড বয় নিতে এলো।

-মা একদম চিন্তা কোরোনা আমি ফিরবো। একদম সুস্থ হয়ে।

মা নীরবে কাঁদছেন। পিতৃহারা একমাত্র ছেলে। কি না কি হয়। "উফফ মা কাঁদবেন না তো।" বলে চোখ মুছ দেয় নিশাত।

-ডক্টর প্লীজ সেভ দেম। ওরা আমার প্রাণ।

-চেষ্টা তো চলছে। আইসিউতে আছে দুজন দেখেন না?

-প্লীজ ডক্টর! কেঁদে-ঘেমে-নেয়ে একহারা অবস্থা।

-ডক্টর দু নম্বর তিন নম্বর দুজনই কেমন যেনো করছে।

-কি?! এইমাত্র না ঔষধ দিয়ে এলাম?

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জাদুকরের চেহারা। এ যে তার স্ত্রী-সন্তানই। ছুটে গেলো এক নিমিষে।

টিটিটিটিটিটি।

সমান তালে বীপসটা শুরু হলো তার স্ত্রীর হার্টবিট রিডারে। হঠাৎ দেখা গেলো প্লেইন

হয়ে গেছে রিডিংটা। সবার মুখ কালো হয়ে গেলো। এর ঠিক দু মিনিট পর বাচ্চাটা মারা গেলো। পুরো ইউনিট স্তব্ধ হয়ে গেছ।

"নায়লা, তন্ময় তোমরা কথা বলো আব্বু আব্বু" পাগল হয়ে যাচ্ছে তানজিম। হঠাৎ চুপ হয়ে গেলো সে। আধা মিনিট পর কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়লো।

ওটি থেকে বেরিয়ে ডক্টর হাসিমুখে তাকালেন রশ্মির মা ও নিশাতের মুখে।

"অপারেশন সাকসেসফুল" খুশী ছড়িয়ে পড়লো আত্মীয়দের ভেতর।

এক সপ্তাহ পর। কেমোথেরাপি দিচ্ছে রশ্মি। ভয় হচ্ছে নিশাতের। হঠাৎ ভেতরে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেলো।

-আরে লেভেল কমান। এই লেভেলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হবে।

-কি কমাবো? অলরেডি কমানো আছে দেখেন না?

হঠাৎ বার্স্ট করলো মেশিনটা। উঠে পড়েছে রশ্মি ওটার ভেতর থেকে। ডাক্তার ছুটে পালালো। কিন্তু একি। সামনে আরেক জন। তার দিকে ধেয়ে আসছে।

বুউউম! তুবড়ে গেলো। একটা নার্স মারা পড়লো। "উপস স্যরি" বললো তানজিম, জাদুকর পাগল হয়ে গেছে। কেবিনে ঢুকেই ডাক্তার থরথর করে কাঁপা শুরু করলো। কাঁধে হাত দিলো কেউ একজন।

-ভয় পাবেন না।

-এব এব এব বাবা তুমি?

মানুষটার শরীরে লাল আভা জ্বলজ্বল করছে। দুহাতে গোলার মতো কি যেনো।

-এই কে তুমি? এখানে কি? পাগলা জাদুকর তানজিম কেবিনে ঢুকেই অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখতে পেলো।

-আমি...রশ্মি...রশ্মিমানব।